Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
***Impact Factor: 6.28** (Index Copernicus International)*
UGC Approved, Journal No: 48666
Volume-VII, Issue-IV, April 2019, Page No. 96-105
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

মিথ বনাম পুরাণ : একটা তুলনামূলক অবক্ষেণ

সোমেন পাল
গবেষক, বাংলা বিভাগ, গৌহাটী বিশ্ববিদ্যালয়

Abstract

Puraṇa is the accumulation of significance of ethnic experience of human generations. The history of universe from creation to destruction, the princes, the warriors, the genealogies of the sages and deties, Hindu cosmology, philosophy and geography have been discussed to puraṇa. The importance of puraṇa is immense. Without the puraṇa, we could not know ---- what our self-identity, what was our behaviour, or how we would separate ourselves from other communities. May be we were bemused. Even now, as far as we are distraught, perhaps would have been more confused than that. Because, the puraṇa was a special role to make decisions of our ancestors on these issues. On the other hand, myth is the answer to the gregarious queries of primitive people ---- an entire nation's abstruct-creation. Many queries about the creation of world, the creation of plants-animals-men, the mysteries of death, the discovery of the fire, the maelstrom, the origin and identity of gods and goddesses were captured in the form of story in the minds of primitive grouped people. This story was associated with miracle. This miracle-related belief that is associated with human culture by the time of the transit is a myth. So, the structure of a nations own heritage is intensely mixed with myth. Myth is the first and only thing with which primitive people had tried to understand the world and the essence of life. In the above article an attempt has been made to discuss the myth with the conscious development of human generation and how that relationship helps us to take lessons from our root.

Key Words: puraṇa, myth, legend, wisdom, experience, tradition.

মিথ মূলত ঐতিহ্যবাহী, প্রাচীন কালের কাহিনি - যাতে আছে অতিপ্রাকৃত প্রাণী, পূর্বপুরুষ, মহাবীর ও বীরাঙ্গনা। ওই কাহিনিতে প্রকাশ পায় জগৎ ও জীবন সম্পর্কে মানুষের মৌলিক ধারণা, প্রকৃতির নানা বৈশিষ্ট্যের ব্যাখ্যা, মন-মানসিকতার স্বরূপ, রীতি-নীতি-প্রথা বা সমাজের আদর্শ। প্রাক-শিক্ষিত সমাজের সত্য ঘটনা হিসেবে মেনে নেওয়া তাদের পূর্বকালের অতিমানবদের কাহিনিকে বলা হয় মিথ। কোনও ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা ঘটনা সম্পর্কে গড়ে ওঠা লোকবিশ্বাসও মিথ। যেমন- নজরুল বিদ্রোহী কবি, জসীম উদ্দীন পল্লীকবি, ফকরুখ আহমদ রেনেসাঁর কবি প্রভৃতি এক একটা মিথ। মিথ অর্ধসত্য কিছু যা গড়ে তোলে কোনও ভাবাদর্শের অংশবিশেষ। যেমন- বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র, মৌলিক গণতন্ত্র, উত্তরাধুনিক কবিতা প্রভৃতি। কাল্পনিক বা অপ্রমাণিত কাহিনি, ব্যক্তি বা বস্তুও মিথ। যেমন- হাতিম তাই, মহাবীর হানিফা, বনলতা সেন প্রমুখ। মিথকে দার্শনিকেরা বলেন রূপক বা প্রতীকাশ্রিত কাহিনি। সাম্প্রতিক সাহিত্য ও সাহিত্য সমালোচনায় মিথ কোনও ধারণাশ্রিত বিষয়বস্তু বা দৃষ্টান্তরূপী চরিত্র। যেমন- রবীন্দ্রনাথের

'জীবনদেবতা', শরৎচন্দ্রের 'দেবদাস', জীবনানন্দের 'রূপসী বাংলা' প্রভৃতি। মিথের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে পাশ্চাত্য সমালোচক বলেছেন,

Myth, a story of the gods, a religious account of the beginning of the world, the creation, fundamental events, the exemplary deeds of the gods as a result of which the world, nature and culture were created together with all parts thereof and given their order, which still obtains. A myth expresses and confirms society's religious values and norms; it provides a pattern of behaviour to be imitated testifies to the efficacy of ritual with its practical ends and establishes the sanctity of cult.[৭]

বিশ্বপ্রকৃতির যা কিছু দুর্বোধ্য তার অন্তরালে অলৌকিক শক্তির কল্পনা করতো আদিম মানুষ। তাদের জীবনযাপনের জন্য অনিবার্য যেসব আচারবিধি পালিত হতো, তারই সূত্র ধরে কালক্রমে গড়ে উঠেছিল গল্প, তাই পরিণত হয়েছে মিথে। আংকিক পদ্ধতির শরণ নিয়ে বলা যায়—

$$\text{Myth= D: } (S_1 + S_2 + S_3 + S_4)....$$
[D= Divinity, S= Story]

মিথ কথাটা এসেছে গ্রিক শব্দ 'mȳthos' (μῦθος) থেকে, যার অর্থ কিংবদন্তি বা লোককথা বা সত্য ঘটনা। শব্দটা ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে ইংরেজিতে ব্যবহার হতে শুরু করে।[৮] এ থেকে বোঝা যায় যে মূলত মানুষের মুখে মুখেই মিথ অন্যদের মাঝে ছড়িয়ে পড়তো। শুধু তাই নয়, এর শেকড় আসলে ছিল সত্যের মাঝেই। সত্য কী? তার ব্যাপারেই মানুষের ধারণা পরিবর্তিত হতে থাকে। ফলে সময়ের সাথে সাথে মিথের সংজ্ঞাও যায় বদলে। প্রথম দিকের বিজ্ঞানী এবং দার্শনিকেরা প্রচলিত মিথের সত্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন। এ থেকেই চলে আসছে মিথের প্রতি সহজাত একটা সন্দেহ এবং অবিশ্বাস। এর প্রায় চারশো বছর পর মিথ সীমিত হয়ে যায় রূপকথা, প্রতীকী গল্প এবং ফিকশন জাতীয় গল্পে। এখনো মিথকে আমরা দেখি এভাবেই, একটা গল্প যার সত্যতার কোনো প্রমাণ নেই। কিন্তু চারশো বছরের পুরানো একটা গল্প যে আসলেই মিথ্যা, সেটাই বা প্রমাণ করা যাবে কীভাবে? এটাতো হতেই পারে যে একটা সময়ে বিভিন্ন সত্য ঘটনা মানুষ মিথের মাধ্যমেই প্রকাশ করতো এবং তা বিশ্বাসও করতো। এই তত্ত্ব অনেকের কাছে আজগুবি মনে হতে পারে। কিন্তু এটা যে সত্যি হতে পারে তার পেছনে রয়েছে যুক্তি। কারণ মিথোলজিতে থাকা এমন কিছু ঘটনা সত্য প্রমাণিত হয়েছে, যাকে মানুষ নিছকই রূপকথা মনে করতো। এর একটা ভালো উদাহরণ হলো ট্রয় নগরী, যাকে ঘিরে গড়ে উঠেছে হোমারের ইলিয়ড। অনেক বছর ধরে এই শহরের অস্তিত্বকে অস্বীকার করা হতো, বলা হতো এটা শুধুই কল্পনা, শুধুই মিথ। ১৮৬৮ খ্রিস্টাব্দে আসলেই এই শহরের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়। একে তখন স্থান দেওয়া হয় ইতিহাসের পাতায়। সুতরাং, অনেক পুরানো বলেই মিথ, মিথ্যে নয়। প্রমাণের অভাব থাকলেই মিথ, মিথ্যে নয়। মিথের মাঝে লুকিয়ে থাকা অনেক গল্পই আসলে সত্যি হতে পারে। মিথের সত্যতা খুঁজে বের করার মাধ্যমে বের হয়ে আসতে পারে ইতিহাসের অনেক বড় বড় রহস্য।

মিথকে একটা ত্রিস্তরীয় ছক উপস্থাপিত করে বিশ্লেষণ করা যায়। গভীরতম স্তরটা হলো অন্তর্লীন প্রেক্ষিত (Context), পরবর্তী স্তরটা হলো আখ্যান (Text), এবং শেষ স্তরটা হলো বহির্বিন্যাস (Texture)। মানব সংস্কৃতির আদিরূপ (Archetype) হলো মিথের অন্তর্লীন প্রেক্ষিত। এর ওপর ভিত্তি করে যে কাহিনি লেখা হয়, তা হলো মিথের আখ্যান। আর সেই কাহিনিকে ভেঙ্গে-গড়ে যখন নতুন কাহিনি সৃষ্টি করা হয়, তখন সেটা হয় মিথের বহির্বিন্যাস।[৯]

মিথের মূল প্রকরণগুলোর মধ্যে এক ধরনের বিশ্বজনীনতা রয়েছে, যা বিচার-বিশ্লেষণ করে সংস্কৃতি-বিজ্ঞানীরা মোট ষোলো রকমের মিথের কথা বলেছেন : ১. জগৎ সৃষ্টির রহস্য; ২. দেব-দেবীদের উদ্ভব; ৩. দেবতা ও

দানবের দ্বন্দ্ব; ৪. মানুষ ও ঈশ্বর সম্বন্ধ; ৫. জন্ম ও মৃত্যু; ৬. মৃত্যু ও অমৃতত্বের সম্বন্ধ; ৭. আত্মা; ৮. জরা, বার্ধক্য, রোগের মূলতত্ত্ব; ৯. স্বর্গ-নরক-পাপ-পুণ্য; ১০. চন্দ্র-সূর্য-গ্রহ-তারা; ১১. দিন ও রাত্রি; ১২. অগ্নির অধিকার লাভ; ১৩. শত্রুসংহার ও মহাপ্লাবন; ১৪. আচার-সংস্কার-রীতি-নীতি; ১৫. বিভিন্ন প্রাণী এবং প্রাকৃতিক সংঘটনের বৈশিষ্ট্য; এবং ১৬. বিভিন্ন শিল্পবস্তুর উৎপত্তি ও মানুষের সভ্যতার ভিত্তি এসব বিষয় নিয়ে সৃষ্টি হয়েছে বিশ্বের সব মিথ।

(২)

এবার আসা যাক, 'পুরাণ' শব্দে। 'পুরাণ' শব্দটা সৃষ্ট পুরা + তন (ষ্টন) যোগে (নিপাতনে 'ত' লোপ এবং 'ণত্ব' নির্দেশ)। ব্যুৎপত্তিগত অর্থ বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, শব্দটা সংস্কৃত 'পুরাতন' থেকে এসে প্রাকৃত 'পুরাঅণ' শব্দের মধ্য দিয়ে বাংলা 'পুরাণ' শব্দে রূপান্তরিত হয়েছে।[১] সাধারণভাবে বলা যায়; যে গ্রন্থে স্থাবর, জঙ্গম, দেবতা, অসুর, গন্ধর্ব, যক্ষ, মনুষ্যাদির বৃত্তান্ত, সৃষ্টি-বিবরণ, ব্রহ্মানুসন্ধান, অন্ততত্ত্ব নির্ণয়, জ্যোতির্বিজ্ঞান, পূর্বতন রাজন্যবর্গের বংশাবলি প্রভৃতি নানা বিষয় সবিশেষ লিখিত আছে; এবং যার দ্বারা ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান অবস্থার পরিজ্ঞান জন্মে, তার নাম পুরাণ। পুরাণ হলো একটা ধর্মীয় বিষয়। পুরাণের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলা হয়েছে,

They are rich in spiritual and philosophical knowledge. Their essential purpose is to elaborate upon the wisdom and the teachings of the Vedas, with the help of stories, drama, allegories and case studies, so that people who have no access to the Vedas or to its knowledge can understand them. . . . . They helped religious people and students engage their minds in the contemplation of God and pursue religious knowledge in a less stressful way.[২]

পুরাণের আবেদন ব্যাপক। জনমানসে সহজেই তার অভিঘাত সৃষ্টি করা যায়। আবার পুরাণকে এখনও সামাজিক মূল্যবোধের মাপকাঠি হিসেবে বিবেচনা করা হয়। বাঙালির সাধারণ কথাবার্তার মধ্যে পৌরাণিক চরিত্র ও ঘটনার প্রভূত উল্লেখ দেখা যায়,

সাধুতা ও সত্যনিষ্ঠার আদর্শ হিসেবে বাঙালি ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠিরের নাম করে। 'অশ্বত্থামা হত ইতি গজ' : এই পরিচিতি উক্তির মধ্যে নিধন প্রসঙ্গে যুধিষ্ঠিরের সত্যমিশ্রিত মিথ্যা ভাষণের পরিচয় পাওয়া যায়। ভীম বাঙালির নিকট শক্তির আদর্শ - অতিভোজনের আদর্শ হিসেবে তিনি বৃকোদর নামে পরিচিত। দ্রৌপদীর রন্ধননৈপণ্য, কুম্ভকর্ণের নিদ্রা, দুর্বাসার ক্রোধ, ত্রিশঙ্কুর আশাভঙ্গ ও মধ্যপথে অবস্থান, ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা, রক্তবীজের বংশ বাঙালির দৃষ্টান্ত-স্থল। কার্তিকের মতো রূপবান পুত্র বাঙালির কাম্য। ঘরের শত্রু বিভীষণ, কালনেমির লঙ্কাভাগ, কুচক্রী শকুনি মামা, দৈত্যগুরু কানা শুক্কুর (শুক্রাচার্য), ... লঙ্কাকাণ্ড, দক্ষযজ্ঞ, মন্বন্তর, গন্ধমাদন, রাবণের অনির্বাণ চিতা, রাবণের গুষ্টি... এ সমস্তই চলতি কথার মধ্য দিয়া বাঙালির নিকট অতি পরিচিত।[৩]

বর্তমান কাল সংকটকেও পুরাণের চিত্রণে উপস্থাপণ করা যায়। লেখন যে কালে অবস্থান করেন সেই কাল তাঁর জীবনভাবনা গড়ে তোলে, আবার সেই জীবনভাবনা অনুযায়ী সাহিত্যে তিনি বর্তমান সময়কে চিত্রিত করেন। সেই সময়কে প্রাণবন্ত করতে তিনি পুরাণের সংবেদনশীল সময়কে আনেন। এই উপস্থাপনের মধ্য দিয়ে লেখকের সময় জীবন্ত হয়ে ওঠে। Thomas Stearns Eliot তাঁর বিখ্যাত 'The Waste Land' কাব্যে মিশরের প্রাচীন Adonis, Attis, Osiris উপাখ্যানকে প্রতীকী ভাবে গ্রহণ করে সমগ্র ইউরোপ সমাজের পটভূমিকায় যুগের রিক্ততা ও অন্তঃসারশূন্যতাকে প্রকাশ করেছেন। এই কাব্যে ঐতিহ্য ও সাম্প্রতিকতা একসঙ্গে মিশে গেছে, ফলে তা চিরকালীন তাৎপর্য লাভ করেছে। অতীতকালের মধ্যে যে চিরকালীন জীবনসমস্যা ও সমাধানের ইঙ্গিত থাকে, কবি ও শিল্পীকে তাই আকৃষ্ট করে; নতুন সৃষ্টির প্রেরণা যোগায়।

পুরাণ একই সঙ্গে লোকসাহিত্য এবং মান্যসাহিত্য- দুইয়েরই ভিত্তিভূমি। পুরাণের কাহিনিগুলি কার বা কাদের দ্বারা রচিত হয়েছিল, সে সম্পর্কে অবিসংবাদী কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। অনেকটা পুরাণ কোনো একক ব্যক্তি মানুষের সৃষ্টি নয়। ফলে পুরাণকে এক অর্থে লোকসাহিত্য বলা যায়। কারণ তা বহুজনের যৌথ সৃষ্টি এবং কোনো একজনের পরিচয় সেখানে পাওয়া যায় না। পরবর্তীকালে পুরাণের সঙ্গে ধর্মীয় বিশ্বাসকে যখন যুক্ত করা হলো, তখন তা আর সাধারণ লোকের রইল না। পুরাণ হয়ে উঠল উচ্চবর্ণের সাহিত্য - শিক্ষিত জনের সৃষ্ট মান্যসাহিত্য।

লোকমতে, মহাভারত-রচয়িতা ব্যাসদেব পুরাণসমূহের সংকলক। যদিও পুরাণের সর্বাপেক্ষা প্রাচীন পাঠগুলি গুপ্ত সাম্রাজ্যের (খ্রিস্টীয় তৃতীয়-পঞ্চম শতাব্দী) সমসাময়িক। এর অধিকাংশ উপাদানই ঐতিহাসিক বা অন্যান্য সূত্রানুযায়ী এই সময়কাল ও তার পরবর্তী শতাব্দীগুলির সঙ্গে সম্পর্কিত। বৃহদারণ্যক উপনিষদ পুরাণকে "পঞ্চম বেদ" নামে অভিহিত করে- "ইতিহাসপুরাণং পঞ্চমং বেদম্"।[৪] মৎস পুরাণ অনুসারে, পুরাণের মূল বিষয় পাঁচটা। এগুলি পঞ্চলক্ষণ (Five Essential Knowledge) নামে পরিচিত :[৫]

১। সর্গ (creation) - ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকাহিনি
২। প্রতিসর্গ (dissolution) - প্রলয় পরবর্তী সৃষ্টিকাহিনি
৩। বংশ (lineages) - দেবতা ও ঋষিদের বংশবৃত্তান্ত
৪। মন্বন্তর (epochs) - প্রথম সৃষ্ট মানবজাতির কাহিনি ও মনুর শাসনকালের কথা
৫। বংশানুচরিতম্ (ancient histories) - রাজবংশের ইতিহাস

শ্রীমদ্ভাগবদপুরাণে এই পাঁচটা লক্ষণ ছাড়াও আরও পাঁচটা লক্ষণের কথা বলা হয়েছে। এগুলো হলো:[৬]

1. **Utaya** – karmic links between the deities, sages, kings and the various living beings
2. **Ishanukatha** – tales about a god
3. **Nirodha** – finale, cessation
4. **Mukti** – moksha, spiritual liberation
5. **Ashraya** – refuge

(৩)

অভিধানে 'মিথ' শব্দটার বাংলা অর্থ পুরাণ। এখন কথা হচ্ছে, 'মিথ' ও 'পুরাণ' কি একই বিষয় নাকি ভিন্ন। ইউরোপীয় ভাষায় পুরাণ শব্দটা নেই। ভারতীয় ভাষায় নেই 'মিথ' শব্দটা। 'মিথ'-এর বাংলা প্রতিশব্দ হিসেবে 'পুরাণ' শব্দটা আমরা স্বীকার করে নিয়েছি। কিন্তু দুটো শব্দের ব্যঞ্জন-পরিসর অনেকটা এক হলেও কিছুটা স্তরের পার্থক্য আছে।

পুরাণ লিখিত সাহিত্য ও মিথ তৈরি হয় মানুষের মনে এবং তা মানুষের মুখে মুখে চলতে থাকে। মিথের জন্ম পুরাণের পূর্বে। মানবসভ্যতা অভ্যুদয়ের পরবর্তীকালে যখন বর্ণ ও শ্রেণিভিত্তিক সমাজব্যবস্থার প্রবর্তন ঘটে, তখন পুরাণের কাহিনিমালা গড়ে ওঠে, আর সেই গল্পকথায় স্থান পায় মিথ।

ইউরোপীয় মিথ এবং আমাদের পুরাণ যদিও ঠিক সমার্থবোধক নয়, তবু ব্যবহারিক প্রয়োজন মেটানোর জন্য সাধারণভাবে আমরা এই দুটোকে পরস্পর প্রতিশব্দ বলেই ধরে নিই। আর যেহেতু বেশিরভাগ বাংলাভাষী মিথ বলতে পুরাণকেই বোঝেন, তাই আমাদেরও সেটা মেনে নিতে আপত্তি নেই।

মানবজীবন একটা নির্দিষ্ট দেহের ভেতর সীমাবদ্ধ, অথচ মানব দেহের বৈশিষ্ট্য এই নির্দিষ্ট সীমানাকে অতিক্রম করা। এই অতিক্রমণের আকাঙ্ক্ষার কারণেই প্রকৃতিতে একমাত্র মানব প্রজন্মেরই রয়েছে সভ্যতা। এই যে

অতিক্রমণের আকাঙ্ক্ষা, মানুষ তার দেহের ভেতর ধারণ করে আসছে, এই আকাঙ্ক্ষা তাকে বৈশ্বিক অনন্তের কথা বলে। বৈশ্বিক অনন্তের অর্থ জ্ঞাত এবং অজ্ঞাত বিশ্বের রহস্য উদ্ঘাটন করার এক চিরায়ত পিপাসা। এই পিপাসার কারণেই মানুষ প্রজ্ঞালব্ধ জীব।

মিথের কথা চিন্তা করার অর্থ মানবজীবনের ভেতর যে অনন্ত আকাঙ্ক্ষা লুকিয়ে আছে সেই আকাঙ্ক্ষাকেই চরিতার্থ করার দিকে ধাবিত হওয়া। আমরা মহাভারতে দেখতে পাই, যযাতি তার জ্যেষ্ঠ পুত্র যদুকে বলেছেন, "বৎস আমি শুক্রের শাপে জরাগ্রস্ত হয়েছি কিন্তু যৌবনভোগে এখনও তৃপ্ত হইনি। আমার জরা নিয়ে তোমার যৌবন আমাকে দাও, সহস্র বৎসর পরে আবার তোমাকে যৌবন দিয়ে নিজের জরা ফিরিয়ে নেব।"[১০] এই যে যৌবনের জন্য আকুতি, এই আকুতিই মানুষকে ক্রমাগত মানুষে উন্নীত করেছে। 'যৌবন' অর্থ এখানে জীবন। এই মহার্ঘ্য জীবনের যথার্থ ব্যবহার কীভাবে সম্ভব সেই পথনির্দেশই করে থাকে পুরাণ।

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই 'পুরাণ'কে অলৌকিক রূপকথা হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে। কিন্তু পুরাণ কথা নিছক কোনো অলীক ভাবনা সম্পর্কিত বিষয় নয়। বরং পুরাণের অতিলৌকিক ঘটনা অথবা পুরাণ বিষয়ক চরিত্রসমূহ এমন বিষয়ের প্রতি আমাদের জ্ঞানদৃষ্টির উন্মোচন ঘটায়, যার অনুভবের অন্তর্মূলে প্রোথিত রয়েছে মানব সভ্যতার ভিত্তি ভূমি তথা মানব প্রজাতির আত্মপ্রকাশের সূক্ষ্ম পর্যায়সমূহ। এই আত্মপ্রকাশ বস্তুত এক ধরণের আধ্যাত্মিক তাড়নার অংশ। যেমন, ডুবন্ত সূর্যের সীমাহীন রূপ অথবা দিগন্তবিস্তৃত পর্বত শ্রেণির মুগ্ধতায় আমরা যখন আত্মহারা হই, তখন আমরা সহসাই এই স্বর্গীয় সত্তার অংশ হয়ে যাই। এই স্বর্গ কোনো অলৌকিক উপাখ্যান নয়; কোনো আধ্যাত্মিক তাড়নাও নয়; বরং এই সব কিছুই আমাদের অভিজ্ঞতাজাত।

আধুনিক বিশ্বে বাস করেও আমরা ভাগ্যে বিশ্বাস করি। নিজেদেরকে তকদিরের ওপর ছেড়ে দিয়ে ভারমুক্ত হওয়ার চেষ্টা করি। অথচ, কোনো ধর্মই সে কথা বলে না। পুরুষকার অর্থ পৌরুষ; আর পৌরুষ থেকেই কর্মফল লাভ সম্ভব। কর্মফলই ভাগ্যকে নিয়ন্ত্রণ করে। ধর্ম আমাদেরকে বলছে; আমাদের ডান কাঁধে রয়েছে শুভ দেবতা, আর বাম কাঁধে অশুভ দেবতা। আসলে আমরা আমাদের বাস্তব অভিজ্ঞতারই ভার বহন করে ফিরছি আমাদের কাঁধে; যা থেকে মুক্তি পেতে আমরা আমাদের সমস্ত শুভ-অশুভের অংশ দেবতাদের ওপর অর্পণ করছি। এতে বরং লাভই হচ্ছে। আমরা মুক্তি পাচ্ছি, ভারমুক্ত হচ্ছি, অথবা শুভ-অশুভের দ্বৈরথের ক্রমাগত মানবিক পথ অনুসন্ধান করছি।

এই যে দেবতা এরাঁ কিন্তু মানব-চরিত্রেরই প্রতিনিধিত্বকারী প্রতিভূ; যাঁরা মানবজীবনের অজ্ঞাত রহস্য উন্মোচন করার ভূমিকায় অংশ নেন। এই রহস্যকে আবার ধারণ করে আছে চিরন্তন প্রকৃতি। কেননা মানুষ তো প্রকৃতিরই অংশ। মানুষের ভেতরেই রয়েছে প্রকৃতির যাবতীয় বিপর্যয় এবং সেই বিপর্যয় থেকে পরিত্রাণের উপায়ও মানুষের অপার সম্ভাবনার ভেতর ঘুমিয়ে আছে। মিথ আমাদের জীবনকে প্রকৃতির সমান্তরালে উন্নীত করতে শেখায়। পুরাণ আমাদের সেই পথে উন্নীত হবার মন্ত্র বাতলে দেয়।

দৃশ্যমান জগতের বাইরে যে সব অনুষঙ্গ বিদ্যমান তাদের রূপক হিসেবে উপস্থাপন করতে গিয়েই বস্তুত পুরাণের জন্ম। উদাহরণ হিসেবে বলতে পারি, শিকারযুগে আমাদের পূর্বপুরুষেরা শিকার থেকে ফেরার পর আগুনের চারপাশে বসে শিকারের গল্প করতো। তারা তাদের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার সাহায্যে ভাবতে শিখেছিল যে মৃত পশুর দেহ থেকে প্রাণবায়ু অন্য কোথাও চলে যায়; যেখানে বাস করেন পরম পুরুষ। এই পরম পুরুষ আনন্দিত হলে, তিনিই তাদের জন্য শিকার পাঠিয়ে থাকেন। আর পরম পুরুষ অসন্তুষ্ট হলে, শিকার তাদের নাগালের বাইরে চলে যায়। এই পরম পুরুষের রহস্য উপস্থাপন করতে গিয়ে তারা রূপকের আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। এই রূপকসমূহই হচ্ছে মিথ। এক সময় জীবনযাপনের প্রয়োজনে মিথসমূহ অলৌকিক ধারণায় উন্নীত হতে থাকে। তখন মিথকে আশ্রয় করেই সৃষ্টি হতে থাকে পুরাণকথা। মানুষ তাদের মিথসমূহ গ্রহণ করেছিল তাদের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা থেকে। ফলে সংগত কারণেই বংশপরম্পরায় আহরিত এই অভিজ্ঞতাই পুরাণকথা হিসেবে প্রতিষ্ঠা পায়।

মানুষ হয়ে ওঠার জন্য পুরাণ আমাদের সাধনার কথা বলে। যেমন, বিভিন্ন ধর্মে এক ধরনের ধ্যান শেখানো হয়; নাম জপ হয়। এতে মন এক ধরনের রহস্যের কেন্দ্রে আবদ্ধ হয় এবং তার অস্তিত্ব, উপলব্ধিতে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করা হয়। যেহেতু মিথ আমাদের ভেতর বিশ্বাসের ভিত্তিমূল দৃঢ় করেছে সভ্যতার জন্মলগ্ন থেকেই, সেহেতু সেই রহস্যে ঘেরা অবিনশ্বরের উপলব্ধিও আমাদের চেতনাকে ছুঁয়ে যায়। ঔপন্যাসিক James Joyce যাকে বলছেন, 'epiphany',[১১] যেখানে আমরা এক ধরনের অবিনশ্বর নান্দনিকতার জালে আবদ্ধ হই; যেখানে অভিজ্ঞতা, নৈতিকতা সবকিছুকে আমরা ছাড়িয়ে যাই।

আধুনিক বিশ্বের প্রেক্ষাপটে Claude Gustave Levi Strauss মিথ বিষয়টার তাৎপর্য উপলব্ধি করে তাঁর 'The meeting of Myth and Science' রচনাতে মিথের গুরুত্বকে বিজ্ঞানের সাথে সমন্বয় করার চেষ্টা করেছেন। তিনি মনে করেন, সতেরো-আঠারো শতকের বিজ্ঞান তার প্রয়োজনেই মিথকে বিচ্ছিন্ন করেছিল এবং অতিক্রম করার চেষ্টা করেছিল। অথচ বর্তমান সময়ের বিজ্ঞান মিথের সাথে নিজেকে সমন্বয় করার চেষ্টা করে চলেছে। ফলে ইতিপূর্বে যা ছিল অলীক এখন আর তা অলীক নয়; কারণ বিজ্ঞান তার ব্যাখ্যা করতে শুরু করেছে।[১২] এ প্রসঙ্গে Mircea Eliade মনে করেন, আধুনিক জীবনেও আমাদের পক্ষে মিথ-মুক্ত মননের অধিকারী হওয়া সম্ভব নয়, বরং আমরা বিবিধ সামাজিক ক্রিয়াদি এমনকি রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে মিথকে সচল রেখে চলেছি। ফলে আধুনিক বিশ্বে বিজ্ঞান সংশ্লিষ্ট জীবনের নিয়ন্ত্রণে থেকেও মিথের রয়েছে নানাবিধ প্রায়োগিক দিক।[১৩]

মিথতত্ত্বের সাথে বিজ্ঞানের প্রসঙ্গ এজন্যই প্রাসঙ্গিক যে, মানব মেধার সামগ্রিক যোগফল এবং মানব প্রজাতির অভিজ্ঞতালব্ধ ক্রমবিকাশের অন্তর্ধারায় মিথ প্রসঙ্গ প্রোথিত। বিষয়টা বিশ্লেষণ করলে উন্মোচিত হতে পারে একটা জাতির উৎসগত পরিচয়, সেই সঙ্গে ঐতিহ্যগত সামষ্টিক চেতনা। ফলে মিথ প্রসঙ্গের সাথে সমাজতাত্ত্বিক, নৃতাত্ত্বিক, মনস্তাত্ত্বিক, ধর্মীয় ও শিল্প- সাহিত্যের বিষয়গুলোও জড়িত। সার্বিক অর্থে বলা সম্ভব, সভ্যতার শৈশব থেকে শুরু করে এ পর্যন্ত ধর্ম ও লোকবিশ্বাসজাত রূপকগুলোই হলো মিথ। আর রূপকের আর রূপকের আড়ালে যে সমস্ত সত্য মানব পরিবারকে জীবনযাপনে সাহায্য করেছে সে সব ইঙ্গিতপূর্ণ সত্যের রূপভাষ্যই পুরাণ।

মানব-পরিবার যখন তার হাজার বছরের প্রজ্ঞাকে ধারণ করতে গিয়ে রূপকের আশ্রয় নেয়, তখন জন্ম হয় মিথের। মানবসভ্যতায় যখন কৃষিজীবন বিস্তার লাভ করতে শুরু করে, তখন মা-মাটি-মেয়ে সমার্থক রূপকের আশ্রয়ে উর্বরতার প্রতীক হিসেবে গোষ্ঠীগত অভিজ্ঞতার শেকড়ে প্রতিষ্ঠিত হয়। আমরা রামায়ণে দেখতে পাই সীতার জন্ম হচ্ছে মাটি থেকে এবং লাঙ্গলের ফলা থেকে, অর্থাৎ কৃষিসভ্যতার অভিজ্ঞতা পুরাণকথার আশ্রয়ে উঠে এসেছে ধর্মকথা হিসেবে। জনক বিশ্বামিত্রকে বলছেন, "অনন্তর একদিন ক্ষেত্রকর্ষণ করতে করতে লাঙ্গলের রেখা থেকে একটি কন্যাকে পাই। ক্ষেত্রশোধনকালে হলরেখা থেকে উত্থিত এজন্য লোকে তাকে সীতা বলে। ভূতল থেকে উঠে সে আমার আত্মজারূপে বড় হয়েছে।"[১৪] 'ক্ষেত্রকর্ষণ' অর্থ বিকশিত হওয়ার সুযোগ কোনো অলীক স্বপ্ন থেকে নয়, বরং বাস্তব জীবন অভিজ্ঞতার ফসলই ধর্ম। ধর্ম মানবগোষ্ঠীকে যেভাবে পথ নির্দেশনা দিয়ে থেকে আধুনিক মানবসভ্যতা আজও সেই বিধিবিধানের ওপর নির্ভর করে আসছে। আবার এই কথাও ঠিক, মানব প্রজন্ম তার প্রয়োজনেই চিরায়ত বিশ্বাসের সাথে যোগ করে নেয় সময়োপযোগী দৈনন্দিন সত্যা ফলে সংগত কারণেই মিথ মানবজীবনের প্রয়োজনের সাথে সংগতি রক্ষা করে বিবর্তিত হয়।

মিথ হলো মানবজন্মের প্রত্ন- অভিজ্ঞতার স্মৃতিভাণ্ডার। এই স্মৃতিভাণ্ডার থেকেই আমরা আমাদের জীবনীশক্তি আহরণ করি; আমরা বেঁচে থাকি; আমরা মৃত্যুকে অতিক্রম করি। মানবদেহ মানবজীবনের সর্বাপেক্ষা মহার্ঘ্য ও রহস্যঘেরা আধার। এই দেহের রয়েছে জন্ম, রয়েছে নিশ্চিত মৃত্যু। এই দেহ যখন মৃত তখন তা জড় আর যখন জীবিত তখন তা অজড়। যে অলীক বস্তুর অনুপস্থিতিতে দেহ জড় পদার্থে পর্যবসিত হয় সেই অলীক বস্তুর ধারণা থেকেই 'আত্মা' বিষয়ের সূচনা এবং তা এক সময় সর্বপ্রাণবাদের (Animism) ধারণা প্রতিষ্ঠিত করে। সমালোচক বলেন,

মৃত্যু কিংবা নিদ্রা হইতেই প্রাগৈতিহাসিক মানুষ আত্মা নামক এক অতিপ্রাকৃত বস্তুর অস্তিত্বের সন্ধন পাইয়াছিল। জীবিত ও মৃতের মধ্যে পার্থক্য কি? একজনের মধ্যে কিসের অভাব তাহাকে জড়ের মত নিশ্চল করিল, আর একজনের মধ্যে কিসের অস্তিত্ব তাহার ব্যতিক্রম করিল?

গুহাবাসী মানুষ একদিন এই কথাই ভাবিতে গিয়া এক অদৃশ্য শক্তির অস্তিত্ব কল্পনা করিলা এই অদৃশ্য শক্তিই আত্মা। [১৫]

প্রশ্ন করা যেতে পারে, আমরা কি আমাদের পূর্বপুরুষ গুহাবাসীদের মত এখনও আত্মায় বিশ্বাস রাখি? যদি বলি আত্মা বলে কিছুই নেই; সেক্ষেত্রে আমাদের ধর্মীয় বিশ্বাসের ভীত হালকা হয়ে আসে; অর্থাৎ আমরা আজ গুহাবাসী না-হয়েও আমাদের প্রত্ন- অভিজ্ঞতাকে পরিত্যাগ করতে পারি না। ত্যাগ করতে পারি না পুরাণকথাকে।

মানুষকে মানুষ হয়ে ওঠার জন্য প্রতিনিয়ত যুদ্ধ করতে হয়। মানুষ চায় নিত্য সুখ, অথচ দেহ নিত্য রিপু দ্বারা আক্রান্ত এবং জরাগ্রস্ত। এই রিপুতাড়িত দেহের আড়েয়ে কীভাবে মানবজীবনকে সফল করে তোলা সম্ভব, সেই শিক্ষা সে পুরাণের কাছে থেকেই পেয়েছে। এই শিক্ষা তাকে বলে দেয়, মানুষ কখনও মানুষ হয়ে জন্ম নেয় না। সে জন্মের পর জন্মের পর থেকে ক্রমাগত তার রিপুর সাথে যুদ্ধরতা। ক্রমাগত মনুষ্যত্বের দিকে এগিয়ে যাবার তাড়নায় তাকে যুদ্ধে লিপ্ত হতে হয়। মনুষ্যত্বের এই চেতনাগত শিক্ষা পেতে হলে আমাদের ফিরে আসতে হয় মিথের রূপকল্পের কাছে। কেননা মিথের রূপকল্প ছাড়া এই অপার চেতনার কথা প্রকাশ করা অসম্ভব।

আমাদের দেহই নরক অথবা স্বর্গের আধার। এই দেহের ভেতরেই রয়েছে ঈশ্বর অথবা শয়তান। যতক্ষণ আমরা দেহ ধারণ করি ততক্ষণই আমাদের জীবন। জন্মের আগে শূন্য; মৃত্যুর পরও আমি শূন্য। সুতরাং দেহকে রোমন্থন করে খুঁজতে হচ্ছে এমন এক রিদম, যে রিদম আমাদের ভেতরে জাগিয়ে দেবে সিম্ফনি।

প্রত্যেক মানুষের অন্তরে রয়েছে' কাম'। 'কাম' অর্থ 'ক্ষয় ও জরা', অবশেষে 'মৃত্যু' এবং 'প্রশান্তি'। 'কাম' থেকেই যাবতীয় পাপের উদ্ভব। পাপ-চেতনা পক্ষান্তরে মিথ-চেতনার অপর পিঠা। এই পাপ-চেতনা, এমনভাবে পৃথিবীর অভিজ্ঞতার আদি-অন্তে ক্রিয়াশীল যে, যার ফলে পৃথিবীর যাবতীয় বস্তুর উদ্ভব। এমন একটা ভয়ানক সত্যের জগৎকে উপস্থাপনের জন্য অনিবার্যভাবেই প্রয়োজন হয় পুরাণকল্পের। পুরাণের এই রূপকল্প মানুষের কাছে মৃত্যুর মতো ভয়ানক ঘৃণিত বিষয়কেও সহনীয় করে তোলে। আমরা যখন বলি 'মৃত্যু তো মানুষের দাস', তখন মানুষের প্রজন্মগত অভিজ্ঞার আলোকে আমাদের অহং আমাদের উন্নীত করে এমন এক চেতনায় যে চেতনায় আলোকে কেবলই মনে হতে থকে মৃত্যু আসলে ভয়ঙ্ক্র কিছু নয়। ফলে পক্ষান্তরে আমরা মৃত্যুকেই দাসত্ববরণে বাধ্য করাই। আমরা হয়ে উঠি চিরন্তন প্রকৃতির অংশ। রামায়ণে পাওয়া যায়,

> *"কামরূপিণী রাক্ষসী নানাপ্রকার রূপ ধারণ করে, কখনও বা অদৃশ্য হয়ে রাম-লক্ষণকে বিমোহিত করে প্রচণ্ড শিলাবর্শণ করতে লাগল। তা দেখে বিশ্বামিত্র বলল্.... রাম, তুমি এই পাপীয়সী দুষ্টচারিণী যজ্ঞনাশিনী যক্ষীকে দয়া ক'রো না, এর মায়াবল বাড়বার আগেই সন্ধ্যার পূর্বে একে বধ কর। রাক্ষসজাতি সন্ধ্যাকালেই দূর্ধর্ষ হয়।"*[১৬]

'রাক্ষস' অর্থ 'কাম'। রাক্ষসের আক্রমণের অর্থ কামের আক্রমণ। মানবদেহ সন্ধ্যাকালে কামতাড়নায় বিকারগ্রস্ত হয়। কাম চরিতার্থ না হলে আসে 'ক্ষোভ'। 'কাম ও ক্ষোভে'র প্রতিরূপ হলো প্রকৃতিজগতের 'ঝড়' ও 'প্রলয়'। যে ঝড় ও প্রলয় কাম ও ক্ষোভের মতোই পৃথিবীকে বিপর্যস্ত করে। ফলে বিনির্মাণের মধ্য দিয়ে মানব প্রজাতি সৃষ্টি করে নতুন পৃথিবীর।

এই যে কাম ও ক্ষোভের মহাবলয়ে জগতের ভাঙা-গড়া, এই ভাঙা-গড়ার সাথে রয়েছে মানব প্রজাতির সংশ্লিষ্টতা। এই সংশ্লিষ্টতার কারণেই জন্ম নেয় সংস্কৃতি-যে সংস্কৃতির কারণেই মানুষ শেষ পর্যন্ত প্রকৃতির অংশ হওয়া

সত্ত্বেও সে প্রকৃতি অপেক্ষা অধিক শক্তিমান। সে মহাজগতের নিয়ন্ত্রক। মানুষের সাথে মহাজগতের ক্রিয়াদির রূপক গল্প উপস্থাপন করে পুরাণ। যেমন, বানররাজ কেশরীর রাজত্ব সুমেরু পর্বতের ওপর। পুঞ্জকলা নামে এক বিদ্যাধরী বানররাজের প্রেমে পড়ে; এই অপ্সরা কোনো এক ঋষির শাপে বানরীরূপ প্রাপ্ত হয়েছে; কেশরীর সাথে বিয়ের পর তার নাম হয় অঞ্জনা। একদিন অঞ্জনার রূপে মুগ্ধ হয়ে বায়ুদেবতা তাকে আলিঙ্গন করেন এবং তার সাথে মিলিত হওয়ার ফলে বায়ুর মত বেগবান এক পুত্রের জন্ম হয়, নাম হনুমান।[১৭] এই পুরাণকথার মর্মার্থ অনুসন্ধান করে বলতে পারা যায়, সুমেরু পর্বত সৃষ্টিরহস্যের মহাশক্তির প্রতি ইঙ্গিত দেয়। বানররাজ কেশরী মানবজাতির আরও এক প্রতীকী উপস্থাপন; যার সাথে মানজাতির সংস্কৃতির বিবর্তন ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সংযুক্ত। বানররাজ কেশরীর স্ত্রী অঞ্জনা জন্ম-সৃষ্টির প্রতীক। বায়ুদেবতার সাথে অঞ্জুনার অনৈতিক মিলনের মধ্য দিয়ে পাওয়া যায় যৌনতা ও ক্ষমতা। কিন্তু যখনই এই যৌনতার সাথে এসে সংযুক্ত হয়েছে মোহনীয়তা- মুগ্ধতা ও প্রেম, তখন যৌনতা হয়ে ওঠে সৃজনশীলতার প্রতীকা ফলে জীবন গতিলাভ করে এবং বায়ুর গতির সমুতুল্য হনুমানের জন্ম হয়; যে হনুমান তার গতিকে ব্যবহার করে মানবজাতির মঙ্গলার্থে।

মানব-পরিবার তাদের হাজার বছ্রের জীবন- প্রবাহের প্রতিটা লড়াই অথবা দৈনন্দিন জীবনে টিকে থাকার প্রচেষ্টাকে চেতনায় ধারণ করে। তাকে অভিজ্ঞতায় ও প্রজ্ঞায় রূপান্ত্রিত করে। সেই লব্ধ অভিজ্ঞতা পরবর্তী জেনারেশনের কাছে পৌঁছে দেবার অনিবার্য আকাঙ্ক্ষায়; বংশপরম্পরায় তাকে রাঁচিয়ে রাখে। এই যে অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের জগৎকে বাঁচিয়ে রাখার বহমান কৌশল, এই কৌশল প্রধানত ভাষাকেন্দ্রিক। এই ভাষা হাজার বছরের মানব অভিজ্ঞতাকে ধারণ করতে গিয়ে হয়ে ওঠে কখনও রূপক গল্প, কখনওবা স্বর্গীয় বাণী। আসলে এই রূপকগল্প বা স্বর্গীয় বাণীগুলো মানবজীবনকে পথ দেখাবার জন্য এতই মূল্যবান ভূমিকা পালন করে আসছে যে শেষ পর্যন্ত তা ধর্মীয় গ্রন্থের র্মযাদা পেয়ে যায়। ফলে মানব-পরিবারে ক্ল্যাসিক লিটরেচর মাত্রই ধর্মীয় গ্রন্থ। কেননা ক্ল্যাসিক লিটরেচরগুলো শুধু একজন মানুষের প্রজ্ঞা, অনুভূতি ও জ্ঞাণোকেঈ ধাড়োন করে হাজারো মানুষের গোষ্ঠীগত চেতনার প্রজ্ঞালব্ধ জ্ঞানের জগৎ যা তারা বংশপরায় বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে অর্জন করেছে। সে তার অভিজ্ঞাতায় জেনেছে 'ঈশ্বর' শুভ শক্তির রূপক; তিনি ত্রাতা। 'শয়তান' অশুভ শক্তির প্রতীক; তিনি বিপথের জাদুকর। এই ইয়ে শুভ-অশুভের দ্বন্ধ; রি যে চিরন্তন দ্বন্দ্বের গতিময় জীবন; এই দ্বন্দ্বমুখর গতিময় জীবনের কারণেই শেষ পর্যন্ত মানুষ হয়র উঠতে পেরেছে প্রকৃত মানুষ-সভ্য মানুষ। মানবজীবনকে সাথে নিয়ে এগিয়ে চলে পুরাণ। পুরাণের রূপকল্প পক্ষান্তরে প্রতিটা মানুষের আধ্যাত্মিক সম্ভাবনার প্রতিরূপ।

হো মারের ইলিয়ডে দেখা যায়, প্রকৃতিশ্রেষ্ঠ অয়াকিলিসকে যখন কিছুতেই দমন করা যাচ্ছে না, এমনকি ভয়ানিক ক্রুদ্ধ নদী স্কামান্দার তার বিশাল জলরাশির সাহায্যে যখন বীর অয়াকিলিসকে প্রতিহত করতে পারছেন না, তখন স্কামান্দারকে অ্যাকিলিসের বিরুদ্ধে বলতে শোনা যায়, "তাকে তামি মুড়ে দেব বালু দিয়ে, তার ওপর গাদা করে দেব অগণন নুড়িপাথর এনে তাকে এত গভীর পলির ভেতর পুঁতে দেব যে গ্রিকরা পরে তার হাড়গোড় একত্র করতে এসে খুঁজেই পাবে না কোনো হাড়।"[১৮] তারপরও অয়াকিলিসকে কেউ দমন করতে পারেনি। দেবতারা পর্যন্ত যখন অ্যাকিলিসের বিপরীতে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত, এমনকি অয়াকিলিস তাঁর মাতা দেবী থেটিসের কাছে জানাতে পেরেছেন তাঁর জীবন সংক্ষিপ্ত, কারণ নিয়তিতে আছে হেক্টরের মৃত্যুর পরপরি তাঁর মৃত্যু হবে।[১৯] এই নিশ্চিত মৃত্যুর কথা জানাতে পারলেও কাঙ্ক্ষিত কোনো অতি দানবীয় শক্তি তাকে প্রতিহত করতে পারেনি।

যদিও এই কাহিনি বীর যুগের। তারপরও আধুনিক যুগে এসে আমরা একই বিষয় লক্ষ্য করি। হতে পারে তা হিরোশিমার ঘটনা অথবা টুইন- টাওয়ারের ঘটনা অথবা ইবাক, আফগানিস্তান অথবা কোনো সুইসাইড- শকোয়াডের উদাহরণ। লক্ষণীয় যে আমরা নশ্বর মানবকুল পরিষ্কার জানি আমাদের মৃত্যু অবধারিত; তারপরও আমরা বীবদর্পে এগিয়ে যাই টিকে থকার যুদ্ধে। মৃত্যুর বিনিময়ে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য নিশ্চিত করে দিয়ে যাই যুদ্ধজয়ের অহংকার। প্রকৃত প্রস্তাবে মানব পেজাতির এই অহংকার মূলত পৌরাণিক অহংকার। যদিও আমাদের স্বীকার করতে

হবে, 'পুরাণ' অবশ্যই ইতিহাস নয়; কিংবা শুধু নিছক রূপকথা নয়, বরং পুরাণকথার আশ্রয়ে আমরা পেয়ে থাকি মানবজাতির সামষ্টিক আকাঙ্ক্ষার প্রতিচ্ছায়াম যা বিবিধ রূপকের ছদ্মবেশে আমাদের সামনে এসে হাজির হয়।

এই হলো মিথের জগৎ। সুতরাং মানুষ মৃত্যুর বিছানা থেকে ফিরে এসে আবিষ্কার করে মানুষের ভেতরের দেবতাকে। সেই সাথে দেখতে পায় দেবতার সাথে যুদ্ধরত শয়তানকে। আর যেহেতু এই দেবতা তার শয়তানের সহাবস্থানেই মানুষের জন্ম; সেহেতু মানুষ এক অপার রহস্যে আবর্তিত অপার সম্ভারনাময় জীব। এই রহস্যের যথার্থ ব্যাখ্যা একমাত্র মিথের আলোকেই উপস্থাপন করা সম্ভব। মানুষ শেষ পর্যন্ত কোথায় যায়? এই জিজ্ঞাসা মানব প্রজন্মের চিরন্তন জিজ্ঞাসা। এর উত্তর মানুষ প্রজন্ম- পরম্পরায় অনুসন্ধান করে। এই অনুসন্ধানের অভিজ্ঞান নিয়ে মিথ আমাদের সামনে উপস্থিত হয়। বিষয়টা বোধগম্য করার লক্ষ্যে আমরা একটা পৌরাণিক কাহিনি বেছে নিতে পারি। যেমন, নীচুবংশ জন্ম এমন এক পৌরাণিক চরিত্র' শবরী। শবরী ব্রক্ষ্মচারিণী। এক সময় এই নারী পম্পা নদীর তিরে মাতঙ্গ ঋষির আশ্রমে মুনি-ঋষিদের পরিচসালিকার দাযিত্ব পালন করেছেন। দায়িত্ব পালনকালে শবরী রমনীকে অপসীরা বলেছিলেন, যদি কোনোদিন 'বাম' এই আশ্রমে এসে তাঁকে দেখা দেয় তাহলে শবরী এমন জাগগায় পৌঁছাতে পারবেন যেখান থেকে কেউ তার কখনও ফেরত আসে না। তারপর থেকে শবরী রামচন্দ্রের অপেক্ষায় প্রতিদিন রামের জন্য বনের ফল সংগ্রহ করে রাখেন। এরপর, একদিন রামচন্দ্র যখন অপেক্ষায় প্রতিদিন্রামের জন্য বনের ফল সংগ্রহ করে রাখেন। একদিন রামচন্দ্র যখন অপহূতা সীতার অন্বেষে সেখানে উপস্থিত হলেন, শবরী করজোড়ে দণ্ডায়পমান হয়ে রামের চরণে পতিত হলেন। রামের প্রশ্নের উৎেত্র শবরী বলেন, রামের শুভ আগমনে তাঁর জন্ম সার্থক এবং গুরূসেবা সফল হলো। এবারে তিনি দেবলোক-প্রাপ্ত হবেন। এইরূপে রামের সেবা করে জটাবতী চীর- অজিনধারিণী শবরী অগ্নিতে দেহ আহুতি দিয়ে স্বর্গলোকে গমন করকেনো।[২০] এই পৌরাণিক কাহিনি আমাদের মৃত্যু-উত্তীর্ণ চিরন্তন জীনবনের কথ বলে। আর তাই জরাপ্রাপ্ত দেহ পরিত্যাগ করে শবরী পৌছে যান চিরন্তন দেবলাকে। পুরাণকল্প একজন মানুষকে নশ্বর পৃথিবীর নশ্বর জীবন থেকে মুক্তি দিয়ে পৌঁছে দেয় এমন এক আধ্যাত্মচেতনকার জগতে, যে জগৎ তাকে দেখতে শেখায় কেনই-বা মানুষ এই প্রকৃতিতে অনুপ্রবেশ করেছে।, এই নশ্বর পৃথিবীতে তার করণীয়ই বা কী; আর অবশেষে তার গন্তব্য কোথায়।

আমরা জানি, মানব প্রজন্মেরত এক সভাতা থেকে আরেক সভ্যতায় উত্তরণ ঘটার কারণে মানুষের জীবনরহস্য বর্ণার ধরনও বদল যেতে থেকে। ফলে মিথির বিবর্তন শুরু হয়। সাথে সাথে বদলে যেতে থেকে লোকাবিশ্বাস। যেমন শিকয়ারি যুগে মানুষের বিশ্বাস ছিল, শিকারের মধ্যেই রয়েছে বাঁচার মূলমন্ত্র।

কিন্তু কৃষি এসে মানুষ বিশ্বাস করতে লাগল যে শস্যবীজের মধ্যাই র‍্যেছে জীবনের অনন্ত সম্ভাবনা মানুষের স্নায়ুতন্ত্রের সঙ্গে জড়িত রয়েছে মিথ এবং এজন্যই তা কেবল মানিসিক নয় দৈহিক পদ্ধতিকেও প্রভাবিত করে। নতুন জীবনে পদার্পণের সময় মানুষঅকে মিথ যেমন পথ দেখায়, তেমনি সেই জীবণ উত্তীর্ণ হতে এবং পরবর্তীকালে মৃত্যুকে সহজভাবে গ্রহণ করতেও তাকে সাহায্য করে মিথের গল্প। আর পুরাণকথার মধ্য দিয়ে-মানব- পরিবার ক্ষবিকের মধ্যে চিরায়তকে অথবা সীমার মাঝে অসীমকে অথবা ব্যক্তির মধ্যে ঈশ্বরতেকে উপলব্ধি করে। ফলে চেতনাগত কারণেই সমষ্টিগত মানবপ্রজাতির বিশ্বাসের শেকড় অনুসন্ধান করতে আমরা আমাদের উপলব্ধিতে এক ধরনের তাড়না বোধ করি। কেননা মানবকুলের বৈশিষ্ট্যই হলো ক্রমাগত শেকড় অনুসন্ধান করে অজ্ঞানতার রহস্য দূরে সরিয়ে ফেলা। আর এই কারণেই আমাদের পক্ষে রহস্যেঘেরা পুরাণকথার বাইরে বসবাস করা সম্ভব হয়ে ওঠে না।

সুত্রনির্দেশ :

১. বন্দ্যোপাধ্যায়, হরিচবণ, বঙ্গীয় শব্দকোষ, খণ্ড ২, কলকাতা: বিশ্বকোষ প্রেস, ১৩৩৯, পৃ.১৯৮৫।

২. Jayaram, v, "Should the Puranas be Considered Mythology.' Hinduwebsite, n.d.www. hinduwebsite.com/ ask/is- purana- anythology.asp. Accessed 28 February 2019.

৩. চক্রবর্তী, চিণতাহরণ, "বাংলায় পুরাণচর্চা," বিশ্বভারতী পত্রিকা, বর্ষ ২০, সংখ্যা ১, শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৭০, পৃ, ১৯।

৪. বৃহদারন্যক উপনিষদ, ২:৪:১০।

৫. "পুরাণ", Wikipedia ১৪ফেব্রুয়ারি ২০১৯ bn. Wikipedia.org/wiki/পুরাণ Accessed 28 February 2019.

৬. Leaman, Oliver (Ed.). Encyclopedia of Asian Philosophy. UK: Routledge, 2001, pp. 440-443.

৭. Honko, Lauri. "The Problem of Defining Myth," sacred Narrative: Readings in the The ory of Myth, Alan Dundes (Ed). USA: University of California Press, 1984, P.49.

৮. "myth, n", "mythes, n." OCD Online, July 2018, www. oed.com/view/Entry/124670. Accessed 28 February 2019.

৯. সেনগুপ্ত, চন্দ্রমল্লী। মিথ-পুরাণের ভাঙাগড়া কলকাতাঃ পুস্তক বিপনি, ২০০১,পৃ.৬।

১০. বসু, রাজশেখর কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস কৃত মহাভারত কলকাতাঃ এম.সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স, ১৪১৮,পৃ.৩৩।

১১. "A sudden spiritual manifestation, whether from some object, scene, event. Or memorable phase of the mind- the manifestation being out of proportion to the significance or strictly logical relevance of whatever produces it." (দ্র.Beja, Morris. Epiphany in the Modern Novel. USA: University of Washington Press, 1971,p. 18.)
"The real gap, the real separation between science and what we might as well call mythical thought for the sake of finding a convenient name, although it is not exactly that ----- the real separation occurred in the seventeenth and the eighteenth century. at the time… it was necessary for science to build itself up against the old generations of the mythical and mythical thought,…. (দ্র . Strauss, Claude Gustave Levi. Myth and Meaning. UK: Routhladge, 2005, p.1.)

১৩. Elied, Mircea. Myth and Reality. William R.Trask (Trans.) USA: Harper & Row, 1963,pp. 18-19.

১৪.বসু রাজশেখর বাল্মীকি রামায়ণ কলকাতা এম.সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স, ১৩৯০, পৃ. ৫৫।

১৫. ভট্টাচার্য, আশুতোষ বাংলার লোকশ্রুতি কলকাতাঃ পুরোগামী প্রকাশনী, ১৯৬০, পৃ.১৯।

১৬. বসু, রাজশেখর , বাল্মীকি রামায়ণ পূর্বোক্ত, পৃ।.২৪।

১৭. "জাম্বুবান কর্তৃক হনুমানের জন্মকথা বর্ণন"। কৃত্তিবাসী রামায়ণ: সুন্দরকাণ্ড।

১৮. মাসরুর, আরেফিন।
হোমার: ইলিয়ড় বাংলাদেশঃ পাঠক সমাবেশ, ২০১৫, পৃ. ৭১৯।

১৯. তদের, ২: ৬৩৭।

২০. সরকার, সুধীরচন্দ্র পৌরানিক অভিধান ১ম. কলকাতা: এম.সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স, আষাঢ় ১৩৬৫, পৃ. ৫০২।